অল্প কথায়
জাতিসংঘ সনদ

2. **The United Nations Charter at your fingertips** (DPI/1378);

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা
বাংলাদেশ

Bengali Version of
The United Naitons Charter at your fingertips
DPI/1738
Translation Adviser : Dr. Nurul Momen
Executive Editor : Kazi Ali Reza

Published by
United Nations Information Centre, Dhaka
UN Office, IDB Bhaban
Begum Rokeya Sharani
Sher-e-Banglanagar
Dhaka-1207, Bangladesh

Published in December 1997
Reprint : October 2000
unic/pub/06-3500

অল্প কথায় জাতিসংঘ সনদ
(বাংলা রূপান্তর)
ডিপিআই/১৭৩৮
অনুবাদ উপদেষ্টা : ড. নূরুল মোমেন
নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা

প্রকাশক
জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা
জাতিসংঘ অফিস, আইডিবি ভবন
বেগম রোকেয়া সরণী
শের-ই-বাংলানগর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৯৭
পুর্নমুদ্রণ : অক্টোবর ২০০০

অল্প কথায়

জাতিসংঘ সনদ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা
বাংলাদেশ

ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভগ্নস্তূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ। এতে সমগ্র মানবজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। দীর্ঘ ৫২ বছর পরও প্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়নি; এখনো জাতিসংঘ সনদের আদর্শ ও মূলনীতি মানবজাতিকে শুধু ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করা নয়, বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের দুঃখ-দুর্দশাও লাঘব করতে পারে।

গত কয়েক দশকে বিশ্বে বহু পরিবর্তন ঘটেছে। এ প্রেক্ষিতে সনদে বড় আকারের সংশোধন সম্ভব না হলেও সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সদিচ্ছা থাকলে একে নমনীয়ভাবে ব্যাখ্যা করে মানবজাতির অগ্রগতি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব।

জাতিসংঘ সনদটি শুধু একটি ঐতিহাসিক দলিল নয়, মানব সভ্যতার একটি বিস্ময়কর অবদানও। তাই ব্যাপকভাবে এর পঠন ও তাৎপর্য অনুশীলন সকলের জন্যই অপরিহার্য।

পরিচালক
জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

ঢাকা
ডিসেম্বর ১৯৯৭

সনদের কাঠামো

মুখবন্ধ		:	আমরা জাতিসংঘভুক্ত জনগণ
অধ্যায়	১	:	উদ্দেশ্য ও মূলনীতি
অধ্যায়	২	:	সদস্যপদ
অধ্যায়	৩	:	অঙ্গসমূহ
অধ্যায়	৪	:	সাধারণ পরিষদ
অধ্যায়	৫	:	নিরাপত্তা পরিষদ
অধ্যায়	৬	:	বিরোধাদির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা
অধ্যায়	৭	:	শান্তির প্রতি হুমকি, শান্তিভঙ্গ এবং আক্রমণাত্মক কার্যাদি সম্পর্কে ব্যবস্থা
অধ্যায়	৮	:	আঞ্চলিক ব্যবস্থাসমূহ
অধ্যায়	৯	:	আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা
অধ্যায়	১০	:	অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
অধ্যায়	১১	:	অস্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে ঘোষণা
অধ্যায়	১২	:	আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থা
অধ্যায়	১৩	:	অছি পরিষদ
অধ্যায়	১৪	:	আন্তর্জাতিক আদালত
অধ্যায়	১৫	:	সচিবালয়
অধ্যায়	১৬	:	বিবিধ ধারাসমূহ
অধ্যায়	১৭	:	অন্তর্বর্তীকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি
অধ্যায়	১৮	:	সংশোধনের নিয়মাবলি
অধ্যায়	১৯	:	অনুমোদন ও স্বাক্ষরদান

সনদটি কি?

১ সনদটি হচ্ছে একটি সংবিধান। এতে রয়েছে ঐসব উদ্দেশ্য ও মূলনীতি, যেগুলোকে ভিত্তি করে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত। একই সঙ্গে এটি একটি চুক্তি, যাতে একটি দেশ স্বাক্ষর দেয় এবং জাতিসংঘের সদস্য হলে যার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সম্মত হয়। ১১১টি ধারা সংবলিত এ সনদ ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর মূল দলিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় মহাফেজখানায় জমা দেয়া রয়েছে।

যদিও আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধান একটি পৃথক চুক্তি, তবু এটি সনদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই কোনো দেশ জাতিসংঘের সদস্য হলে স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধানের অংশীদার হয়।

সনদটি কখন তৈরি হয়?

খসড়া তৈরির পর সনদটি স্বাক্ষরদানের জন্য সম্পূর্ণ করা হয় ১৯৪৫ সালে। ৫০টি দেশ সান ফ্রান্সিসকো-তে মিলিত হয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার জন্য চুক্তির খুঁটিনাটি চূড়ান্ত করে। দীর্ঘ ও জটিল আলাপ-আলোচনার পর ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন সনদটি স্বাক্ষরিত হয় এবং ঐ বছর ২৪ অক্টোবর কার্যকর হলে এটি একটি বাধ্যতামূলক চুক্তিতে পরিণত হয়। তারপর থেকে প্রতি বছর ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।

সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো কি?

সংস্থাটির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে :

- আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা;
- জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা;
- জনগণের জীবনমান বৃদ্ধিতে সহায়তাদানের লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ করা এবং একে অন্যের অধিকার ও স্বাধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রর্দশনে উৎসাহ দান; এবং
- এসব লক্ষ্য অর্জনে জাতিসমূহকে সহায়তাদানের জন্য একটি কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা।

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সনদ কি বলছে?

সনদের ২ ধারা অনুযায়ী সকল সদস্যরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও সমতাই জাতিসংঘের ভিত্তি। সংস্থাটি বিশ্ব সরকার নয়। তবে এতে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়ার ও মানবজাতির উদ্বেগের কারণ এমন যে-কোনো বিষয়ে বিহিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। সনদে এমন কিছু নেই যা জাতিসংঘকে কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার দেয়। এরূপ বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য কোনো দেশকেও জাতিসংঘের দ্বারস্থ হতে হবে না।

কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ এখতিয়ারভুক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে সনদের ভাষা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। তবে, নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে এমন যে-কোনো বিষয় ঐ পরিষদ বিবেচনা করতে পারে। অনুরূপে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোও জাতিসংঘের উপযুক্ত সংস্থাসমূহ আলোচনা করতে পারে।

সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গগুলো কি?

জাতিসংঘের ছয়টি প্রধান বা মূল অঙ্গ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে : সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, আন্তর্জাতিক আদালত ও সচিবালয়। আন্তর্জাতিক আদালত বাদে সব অঙ্গেরই অবস্থান জাতিসংঘের সদর দফতর নিউইয়র্কে। আন্তর্জাতিক আদালত নেদারল্যান্ডস-এ দি হ্যাগ শহরে অবস্থিত।

নিরাপত্তা পরিষদ	সাধারণ পরিষদ	অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
আন্তর্জাতিক আদালত	সচিবালয়	অছি পরিষদ

কোন্ অঙ্গসংস্থা জাতিসংঘের সকল সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে গঠিত এবং এর কার্যাবলি কি?

সাধারণ পরিষদ সম্পর্কিত চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, এ পরিষদ কেন্দ্রীয় অঙ্গসংস্থা হিসেবে অন্যান্য অঙ্গসংস্থার কাজের মধ্যে সমন্বয় করে। ৯ ধারা অনুযায়ী, এ পরিষদ জাতিসংঘের সদস্য এমন সকল দেশের সমবায়ে গঠিত। কেবল সনদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ববলে নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনাধীন কোনো বিরোধ বা পরিস্থিতি ব্যতীত আন্তর্জাতিক শান্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য যে-কোনো বিষয়ের ওপর সাধারণ পরিষদ আলোচনা এবং সুপারিশ করতে পারে। এ পরিষদ অন্যান্য অঙ্গসংস্থা ও মহাসচিবের কাছ থেকে প্রতিবেদন গ্রহণ করে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘে নতুন সদস্য গ্রহণ করে এবং মহাসচিব নিযুক্ত করে। প্রতি বছর নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি নতুন অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন করা এর কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। জাতিসংঘকে প্রতিটি দেশ কি পরিমাণ চাঁদা দিবে এবং এ অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হবে এ পরিষদই তা স্থির করে। অর্থাৎ বলতে গেলে এটাই সংস্থাটির খরচপত্রের নিয়ন্ত্রক।

জাতিসংঘের আওতায় পড়ে এমন যে-কোনো বিষয়ে সাধারণ পরিষদ পদক্ষেপ নিতে পারে। এসব বিষয়ের কয়েকটি হচ্ছে : মানবাধিকার, জনসংখ্যা, উন্নয়ন, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, শরণার্থী, সমুদ্র আইন বা মহাশূন্য। এ পরিষদ সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সকল ক্ষেত্রে মান স্থাপন করে। সাধারণ পরিষদের বেশির ভাগ সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক নয়, সুপারিশ মাত্র। তবে এর সিদ্ধান্তসমূহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নৈতিক ভার বহন করে। এটা এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে বহুপাক্ষিক চুক্তির খসড়াও তৈরি করা হয়। নির্দিষ্টসংখ্যক দেশের অনুমোদনের পর এরূপ চুক্তি ঐসব দেশের জন্য কার্যকর হয় এবং আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা লাভ করে।

শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রধান দায়িত্ব কোন্ অঙ্গসংস্থার ওপর ন্যস্ত এবং এর সদস্য সংখ্যা কত?

সনদের পঞ্চম অধ্যায় অনুসারে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ প্রধান অঙ্গসংস্থা। জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত সকল দেশ এর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে এবং তা কার্যকর করতে সম্মত রয়েছে।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে এমন আন্তর্জাতিক বা কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিবাদাদি নিরাপত্তা পরিষদ নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করবে। পরিষদ বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে চুক্তির জন্য আলোচনা চালাতে উৎসাহ দান, অনুসন্ধান মিশন প্রেরণ অথবা উপযুক্ত অবস্থা বিরাজ করলে একটি শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা করতে পারে। কোন্ দেশগুলোকে নতুন সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে অথবা কাকে মহাসচিব নিযুক্ত করা যেতে পারে, সে-বিষয়ে সাধারণ পরিষদের কাছে সুপারিশ করাও এর দায়িত্ব। তাছাড়া এ পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ যৌথভাবে আন্তর্জাতিক আদালতের সদস্যদের নির্বাচিত করে থাকে।

নিরাপত্তা পরিষদে ১৫টি সদস্য রয়েছে। পাঁচটি দেশ স্থায়ী সদস্য, যথা– চিন, ফ্রান্স, রুশ ফেডারেশন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে এ দেশগুলোই ছিলো প্রধান মিত্রশক্তি। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নেয়া দশটি দেশ অস্থায়ী সদস্য হিসেবে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক দু'বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয় (প্রশ্ন ২১ দ্রষ্টব্য)।

ভেটো ক্ষমতা কি এবং সনদে কোথায় এর উল্লেখ রয়েছে?

ভেটো নিরাপত্তা পরিষদের সঙ্গে জড়িত। এটি একটি বিশেষ ক্ষমতা, যার বলে এ পরিষদের পাঁচটির যে-কোনো একটি স্থায়ী সদস্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে না-সূচক ভোট দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বানচাল করে দিতে পারে। সনদে ভেটো শব্দটির উল্লেখ নেই, কিন্তু তা প্রচ্ছন্ন আছে ২৭ ধারার শর্তসমূহে, যেখানে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের যৌথ সম্মতির কথা বলা হয়েছে। পরিষদের রীতি অনুযায়ী যৌথ সম্মতি বলতে ইতিবাচক ভোট, নিবৃত্ত ভোট প্রদান অথবা এমন কি কোনো স্থায়ী সদস্যের ভোটে অংশগ্রহণ না করাকে বোঝায়। সুতরাং, পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের প্রত্যেকেরই সিদ্ধান্ত নাকচ করার একচেটিয়া ক্ষমতা রয়েছে।

কোন্ কোন্ অধ্যায়ে শান্তি সংরক্ষণ ও পুন:প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে?

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিরোধাদির শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পদ্ধতিগুলোর কথা বলা হয়েছে। মধ্যস্থতা, সালিশি, আপোস বা বিচার বিভাগীয় নিষ্পত্তি এসব পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। নিরাপত্তা পরিষদ সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে তাদের নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজে নিতে আহ্বান জানাতে পারে অথবা তাদের কাছে নিষ্পত্তির শর্তসমূহও সুপারিশ করতে পারে। পরিষদ অন্য যেসব পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকে, সেগুলো হচ্ছে তদন্ত দল বা অনুসন্ধান কমিশন গঠন অথবা মহাসচিবকে তাঁর শুভ-সংযোগ প্রসারিত করার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন।

সপ্তম অধ্যায়ে বলপ্রয়োগ ও অন্যান্য ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে। যদি আগ্রাসন অব্যাহত থাকে অথবা শান্তির প্রতি হুমকি থাকে অথবা শান্তি ভঙ্গ হয় অথবা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত মেনে না নেয়, তবে এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। পরিষদ আরো বলিষ্ঠ পদক্ষেপও নিতে পারে। অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা জারি অথবা ব্যাপক অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ আরোপ, কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য রাষ্ট্রসমূহকে আহ্বান অথবা সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি দানও পরিষদের এখতিয়ারভুক্ত। ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে এঙ্গোলা, ইরাক, লাইবেরিয়া, লিবিয়া, সোমালিয়া ও সাবেক যুগোশ্লাভিয়াসহ সাতটি সদস্যরাষ্ট্র বা পক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা, সার্বিক অথবা আংশিক অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ কার্যকর ছিল। ঐ সময় নিরাপত্তা পরিষদ রোয়ান্ডা সরকারকে ১৯৯৪ সালের আগস্ট মাসে আরোপিত অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা থেকে অব্যাহতি দেয়। কিন্তু রোয়ান্ডায় ব্যবহারের জন্য বেসরকারি অস্ত্র বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখে।

সম্প্রতি নিরাপত্তা পরিষদ শক্তিপ্রয়োগের সংজ্ঞায় আসে এমন পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানায়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে ইরাক-কুয়েত সীমান্তে বাহিনীমুক্ত এলাকা পরিধারণের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ একটি জাতিসংঘ ইরাক-কুয়েত পর্যবেক্ষণ মিশন গঠন করে। ১৯৯৩ সালের মে মাসে পরিষদ ইরাক-কুয়েত সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিশনের সিদ্ধান্তসমূহ যে চূড়ান্ত তা পুনর্ব্যক্ত করে এবং ঐ সীমারেখার অলঙ্ঘনীয়তা নিশ্চিতকরণে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়। এছাড়া পরিষদ ১৯৯৩ সালের মে মাসে সাবেক যুগোশ্লাভিয়ায় মানবিক আইন ভঙ্গকারীদের অভিযুক্ত করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইবুন্যাল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯৪ সালের নভেম্বরে রোয়ান্ডার জন্যও একটি অনুরূপ ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয়। ঐসব সিদ্ধান্তই সনদের সপ্তম অধ্যায়ের অধীনে গৃহীত হয়।

উল্লেখ্য, সনদের ৫১ ধারা মোতাবেক যদি কোনো সদস্যরাষ্ট্র আক্রান্ত হয়, তবে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক শান্তি বজায় রাখা বা পুনর্প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে ঐ রাষ্ট্র আত্মরক্ষার জন্য একক বা যৌথভাবে সংগঠিত হওয়ার পদক্ষেপ নিতে পারে।

শান্তির জন্য শক্তি প্রয়োগ সংক্রান্ত সনদের কোন্ কোন্ ধারা এখনো কার্যকর হয়নি?

সনদের ভিত্তি হচ্ছে যৌথ নিরাপত্তার ধারণা, যার দ্বারা এক দেশ কর্তৃক অপর দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি বৈরী আচরণ বলে বিবেচিত হবে। অন্য কথায় যে-কোনো এক স্থানে সংঘাত সকল স্থানের শান্তির জন্য বিপজ্জনক। এরূপ প্রত্যাশা ছিল যে, যদি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামরিক শক্তি সম্মিলিতভাবে রুখে দাঁড়াতে পারে, তবে কোনো দেশই শান্তিভঙ্গ করার দুঃসাহস দেখাবে না।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য জাতিসংঘের সদস্যদেশগুলো নিরাপত্তা পরিষদকে সামরিক বাহিনী, সহায়তা ও সুবিধাদি দিবে। এসব বাহিনী 'তলবমাত্র' এ পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের সামরিক প্রধানদের প্রতিনিধিমণ্ডলীর সমবায়ে গঠিত সামরিক স্টাফ কমিটির কর্তৃত্বাধীনে থাকবে। কমিটির কাজ হবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য সামরিক প্রয়োজন সম্পর্কিত সকল বিষয়ে এর অধীনে ন্যস্ত সামরিক বাহিনীর অধিনায়কত্ব ও নিয়োগাদি, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও সম্ভাব্য নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান। তবে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রায় অব্যবহিত পরেই শীতল যুদ্ধের কারণে এ প্রস্তাব কখনো কার্যকরি হয়নি; ৪৩ ধারা থেকে ৪৭ ধারা এখনো কার্যকর হয়নি।

কোন অধ্যায়গুলোতে শান্তিরক্ষার কথা বলা হয়েছে?

সনদে শান্তিরক্ষার সুনির্দিষ্ট উল্লেখ নেই। এটি সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত রাখার জন্য জাতিসংঘের উদ্ভাবিত একটি কৌশল। এর দ্বারা যুদ্ধবিরতিকালে দুই বা ততোধিক বৈরী পক্ষের মধ্যে জাতিসংঘ কমান্ডের অধীন বহুজাতিক বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়। রাজনৈতিক সমাধান অনুসরণ অব্যাহত রেখে যুদ্ধবিরতিকে কিছুটা স্থিতিশীল করাই এর উদ্দেশ্য। জাতিসংঘ ইতিহাসের বেশির ভাগ সময়ে শান্তিরক্ষা একটি সহজ সরল ধারণা বলে গণ্য হয়েছে। সংঘাতের সঙ্গে জড়িত সকল পক্ষই স্বাগত জানিয়েছে শান্তিরক্ষা বাহিনীগুলোকে, যাদের সাধারণত মোতায়েন করা হতো আলোচনার মাধ্যমে সৃষ্ট যুদ্ধবিরতি অথবা চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য।

সংঘর্ষের গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে আজ শান্তিরক্ষা অনেক বেশি জটিল হয়ে পড়েছে। আন্তঃরাষ্ট্র সংঘর্ষের চেয়ে রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে সংঘর্ষ এখন বেশি ঘটছে। সাম্প্রতিককালে শান্তিরক্ষকদের পাঠানো হয়েছে এমন জায়গায়, যেখানে কোনো চুক্তি নেই, নেই জাতিসংঘের উপস্থিতির ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট সম্মতি বা সরকারের কোনো অস্তিত্বও। এ নতুন যুগে শান্তিরক্ষা শুধু যুধ্যমান পক্ষগুলোকে পৃথক করে রাখা বোঝায় না। এখন দায়িত্ব বহুমাত্রিক হয়েছে। এরই মধ্যে রয়েছে চুক্তিসমূহের মান্যতা পরীক্ষা, নির্বাচন তত্ত্বাবধান, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে উৎসাহ দান, উপদলগুলোকে অস্ত্রমুক্তকরণ, স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও পরিধারণ, অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে রক্ষণাবেক্ষণ এবং মানবিক সাহায্য বিতরণ।

১৯৯২ সালে 'শান্তির লক্ষ্যে কার্যসূচি' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে মহাসচিব সংস্থাটির দক্ষতা বিস্তৃত ও শক্তিশালী করার জন্য কিছু প্রস্তাবের রূপরেখা প্রকাশ করেন। বিশেষ করে জাতিসংঘের এ পরিবর্তনশীল ভূমিকার আর্থিক ও বাস্তব তাৎপর্যের সমন্বয় সাধন করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। উদহারণস্বরূপ, তিনি নতুন শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের প্রারম্ভিক ব্যয় বহন উপযোগী একটি সংরক্ষিত তহবিল গঠনের আহ্বান জানান। ১৫০ মিলিয়ন লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে সাধারণ পরিষদ ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে এ তহবিল গঠন করে; কিন্তু এখনো তা ঐ পর্যায়ে পৌঁছায়নি। মোতায়েনকৃত সেনাদলের ব্যয়ভার গ্রহণ অথবা সরঞ্জামাদি দিয়ে সহায়তার দ্বারাও সরকারগুলোকে অবদান রাখতে উৎসাহিত করা হয়। সামরিক ও বেসামরিক শান্তিরক্ষকদের প্রশিক্ষণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়। সরঞ্জাম সম্পর্কিত পরিকল্পনায় ও সামরিক কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণে আরো দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনের কথাও বলা হয়।

'শান্তির লক্ষ্যে কার্যসূচি'তে মহাসচিব একটি ক্ষুদ্র, বহুজাতিক বাহিনী গঠনের প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবিত বাহিনীকে নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্বাধীনে সক্রিয় করা যাবে এবং সঙ্কটকালে দ্রুত মোতায়েন করা সম্ভব হবে। অবশ্য দ্রুত-প্রতিক্রিয়া বাহিনী সম্পর্কিত মহাসচিবের ধারণাটি নিরাপত্তা পরিষদ এখনো অনুমোদন করেনি।

'শান্তির লক্ষ্যে কার্যসূচি' অনুযায়ী শান্তিরক্ষার জন্য সংরক্ষণ বাহিনী গড়ে তোলার অন্য একটি প্রস্তাব এখন অনুসরণ করা হচ্ছে। এ ব্যবস্থা জাতিসংঘকে নতুন এবং চালু শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সম্ভার দ্রুত মোতায়েন করার ক্ষমতা প্রদান করে এবং একই সঙ্গে সদস্যরাষ্ট্রসমূহকে ক্ষেত্রভিত্তিক অংশগ্রহণে সম্মত হওয়ার সুযোগ দেয়।

১৯৯৫ সালের জানুয়ারিতে 'শান্তির লক্ষ্যে কার্যসূচির একটি সম্পূরক' প্রকাশিত হয়। মহাসচিব এতে উল্লেখ করেন যে, বর্তমান সংঘাতসমূহের বেশির ভাগ রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরে ঘটছে, সেনাবাহিনী ও অনিয়মিত সেনারা এসব যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে। প্রধানত বেসামরিক জনগণই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। এ 'নতুন জাতের' সংঘাতগুলো প্রায়ই জরুরি মানবিক ত্রাণকাজে জড়িয়ে পড়ে, যা সমাধান করা যোগ্য কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার বাইরে হতে পারে।

যেসব ক্ষেত্রে সদস্যরাষ্ট্রসমূহকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে সম্পূরকটি সেগুলো তুলে ধরেছে। এসবের মধ্যে রয়েছে: অর্থায়ন, শান্তিরক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত নির্দেশের সুস্পষ্টতা এবং আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সহায়তায় পরিচালিত কার্যক্রম।

আঞ্চলিক ব্যবস্থাগুলো সম্পর্কে সনদ কি বলছে?

আঞ্চলিক ব্যবস্থা ও এজেন্সিগুলোই সনদের অষ্টম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। নিরাপত্তা পরিষদে পেশ করার আগে সদস্যদেশগুলোকে তাদের স্থানীয় বিরোধাদি এরূপ আঞ্চলিক সংস্থার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা চালাতে হবে। আঞ্চলিক ব্যবস্থাসমূহ নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্বাধীনে এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে বলপ্রয়োগের জন্যও পদক্ষেপ নিতে পারে।

এসব আঞ্চলিক ব্যবস্থা কি ধরনের হবে সে সম্পর্কে সনদে কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। তবে এসব ব্যবস্থা ও কার্যাদি জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে এবং তা হলেই আঞ্চলিক পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ কালে যে-কোনো রাষ্ট্রগোষ্ঠীর থাকবে কার্যকর নমনীয়তা অবলম্বনের সুযোগ, যা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অবদান রাখতে পারে। যেমনটি 'শান্তির লক্ষ্যে কার্যসূচি'তে উল্লেখ করা হয়েছে, জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার আগে বা পরে যখনই জন্ম হোক না কেন, চুক্তিসৃষ্ট সংস্থাসমূহ এ ধরনের জোট বা সত্তা।

পারস্পরিক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা, আঞ্চলিক উন্নয়ন অথবা অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য গঠিত গোষ্ঠীসমূহও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। জাতিসংঘের সহযোগিতায় কয়েকটি আঞ্চলিক সংস্থা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পশ্চিম সাহারা ও লাইবেরিয়ার ব্যাপারে আফ্রিকীয় ঐক্য সংস্থার উদ্যোগ এবং জাতিসংঘ সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে ন্যাটোর উড্ডয়ন নিষিদ্ধ এলাকা ও বসনিয়ায় নিরাপদ এলাকাসমূহের অলঙ্ঘনীয়তা বলবৎ করার প্রয়াস।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য সনদে কি ব্যবস্থা রয়েছে?

সনদের নবম ও দশম অধ্যায়ে উচ্চতর জীবনমান, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাদির সমাধান ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রধান অঙ্গসংস্থা হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং সাধারণ পরিষদে সুপারিশাদি পেশ করতে পারে। এ পরিষদ মানবাধিকার সম্পর্কে উৎসাহ যোগানোর ব্যাপারে সুপারিশাদি প্রস্তুত এবং সাধারণ পরিষদে পেশ করার জন্য চুক্তিসমূহের খসড়াও তৈরি করতে পারে। অঙ্গসংস্থাটি কোনো বিশ্ব সমস্যাকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আহ্বান জানিয়ে সরকারসমূহ ও জনগণকে ঐ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে অধিকতর সক্রিয় করে তুলতে পারে।

জাতিসংঘ ব্যবস্থার কার্যক্রমসমূহের সমন্বয় সাধনের কর্তৃত্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ওপরই ন্যস্ত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতিসংঘ শিশু তহবিল ও জাতিসংঘ শরণার্থী সংক্রান্ত হাই কমিশনারের মতো সাধারণ পরিষদ কর্তৃক সৃষ্ট কার্যক্রমসমূহ এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মতো বিশেষ এজেন্সিসমুহের কার্যাদি। বিশেষ এজেন্সিগুলো স্বাধীন সংস্থা; এদের নিজস্ব বাজেট, সদর দফতর ও সদস্যরাষ্ট্র রয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ চুক্তি সম্পাদন করে এগুলোকে জাতিসংঘের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কের অধীনে নিয়ে আসতে পারে। বর্তমানে ৩০টিরও অধিক কার্যক্রম ও বিশেষ এজেন্সি রয়েছে এবং এগুলোরই সমবায়ে বৃহত্তর জাতিসংঘ ব্যবস্থা গঠিত। শরণার্থী থেকে বাণিজ্য এবং বাণিজ্য থেকে বেসামরিক বিমান চলাচল পর্যন্ত মানবজাতির কর্মকাণ্ড ও উন্নয়নের প্রায় সকল স্তরে এগুলো একত্রে নিয়োজিত রয়েছে।

১৯৯৪ সালের মে মাসে মহাসচিব 'উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যসূচি' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় উন্নয়নের অনুসন্ধান অবশ্যই বহুমাত্রিক হতে হবে এবং এর সঙ্গে শান্তি, অর্থনীতি, পরিবেশ, সামাজিক ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এরই দুটি অতিরিক্ত উপাদান হচ্ছে, সদস্য-রাষ্ট্রগুলোর মতামত এবং ঐ মতামতের পরিপেক্ষিতে মহাসচিবের সুপারিশগুলো। মহাসচিব এটা সুস্পষ্ট করে দেন যে, উন্নয়নই মানবজাতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যদিও শান্তিরক্ষার জরুরি প্রয়োজনে আমরা উন্নয়নের চ্যালেঞ্জকে ভুলে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে থাকি।

অস্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলোর ব্যাপারে সনদের প্রত্যাশা কি?

যেসব এলাকার জনগণ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতে পারেনি, তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায় ব্যক্ত হয়েছে। একাদশ অধ্যায়ে রয়েছে স্বায়ত্তশাসন-বঞ্চিত অঞ্চলগুলো সম্পর্কে একটি সমন্বিত ঘোষণা, যা ঐ সমস্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের স্বায়ত্তশাসন ও তাদের রাজনৈতিক, শিক্ষাগত ও সামাজিক অগ্রগতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

সদস্যরাষ্ট্রগুলো স্বীকার করে যে, ঐসব অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থই সর্বোচ্চ, তাদের যথাসম্ভব কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব একটি পবিত্র আমানত বলে গ্রহণ করে। সনদের ৭৩ ধারার অধীন অস্বায়ত্তশাসিত এলাকাগুলোর শাসনকারী দেশগুলো এ উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের স্ব স্ব দায়িত্বাধীন এলাকার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে মহাসচিবের কাছে খবরাখবর পাঠাতে সম্মত হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অধীনে অছি ব্যবস্থার ওপর নজর রাখার জন্য অছি পরিষদ সৃষ্টি করা হয়। অছি ব্যবস্থার দ্বারাই জাতিসংঘ অছি এলাকাগুলোর প্রশাসন তত্ত্বাবধান করে।

জাতিসংঘ ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে একক চুক্তির মাধ্যমে অস্বায়ত্তশাসিত অছি এলাকাগুলো স্বেচ্ছায় এ ব্যবস্থার অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ১৯৯৪ সালের অক্টোবরে প্রায় অর্ধশত বছর পর সর্বশেষ অছি এলাকা– যুক্তরাষ্ট্রশাসিত পালাউ দ্বীপ–স্বায়ত্তশাসন অর্জন করায় অছি পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে এর কার্যক্রম স্থগিত করে দিয়েছে।

১৯৬০ সালে সাধারণ পরিষদ ঔপনিবেশিক এলাকাগুলোর ও জনগণের স্বাধীনতা মঞ্জুর সংক্রান্ত ঘোষণা গ্রহণের মাধ্যমে উপনিবেশ বিলোপ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। ঐ সময় অছি ব্যবস্থাধীন ১১টি এলাকা ছাড়া আরো অনেক এলাকা উপনিবেশ হিসেবে বিশ্বে বিরাজ করে। ঐ ঘোষণার বাস্তবায়ন পর্যালোচনার জন্য উপনিবেশ বিলোপ সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। এক্ষেত্রে জাতিসংঘের কর্মতৎপরতার ফলে ৭৫ কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত ৭০টিরও বেশি এলাকা স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং জাতিসংঘে যোগ দিয়েছে।

সচিবালয় সম্পর্কে সনদ কি বলেছে?

সনদ সচিবালয়কে জাতিসংঘের একটি প্রধান অঙ্গ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে (প্রশ্ন ৫ দ্রষ্টব্য)। ৯৭ ধারা অনুযায়ী একজন মহাসচিব এবং প্রতিষ্ঠানটির জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারীদের নিয়ে সচিবালয় গঠিত হবে। ১০০ ধারা বলছে যে, কর্মচারীগণ কোনো সরকারের কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করতে পারবেন না এবং সদস্যরাষ্ট্রগুলোও কোনো কর্মচারীকে কর্তব্য সম্পাদনে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে না। অবশ্য এতে সচিবালয়ের কাজকর্ম কিভাবে সংগঠিত হবে সে সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। আন্তর্জাতিক 'সিভিল সারভেন্টস্' বলে পরিচিত সচিবালয়ের কর্মচারীবৃন্দ মহাসচিবের অধীনে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর কল্যাণকল্পে কর্তব্য সম্পাদন করে থাকেন। জাতিসংঘ সচিবালয়ের আনুমানিক ৪,৮০০ কর্মচারী বিশ্বব্যাপী নিয়োজিত রয়েছেন। বিশেষ এজেন্সিগুলো নিজস্ব কর্মীবৃন্দ নিয়ে কাজ করে থাকে। ফলে বৃহত্তর জাতিসংঘ ব্যবস্থার অধীনে কর্তব্যরত কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৫৩ হাজার।

সনদের কোন্ কোন্ ধারায় মহাসচিবের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে?

৯৭ ধারা মহাসচিবকে শুধু সচিবালয়ের প্রশাসনের দায়িত্ব দেয়নি, তাঁকে সমগ্র জাতিসংঘের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবেও আখ্যায়িত করেছে।

৯৮ ধারা মহাসচিবকে সংস্থাটির কাজকর্ম সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশের আহ্বান জানায়। এ বার্ষিক অনুশীলন তাঁকে শুধু বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জাতিসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করা নয়, সংস্থাটি পরিচালনা ও এর কার্যক্রমের অগ্রাধিকারগুলো নির্ধারণ করারও সুযোগ দেয়।

৯৯ ধারা মহাসচিবকে নিরাপত্তা পরিষদে এমন যে-কোনো বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করার সুযোগ দেয়, যা তাঁর বিবেচনায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬০ সালে কঙ্গো সঙ্কটের সৃষ্টি হলে মহাসচিব দ্যাগ হ্যামারশোল্ড-ই সর্বপ্রথম ৯৯ ধারার অধীন ক্ষমতা ব্যবহার করে ব্যাপারটি নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টিগোচর করেন। এ ধারার সর্বসাম্প্রতিক সহায়তা নেয়া হয় ১৯৮৯ সালে মহাসচিব জেভিয়ার পেরেজ দ্য কুইলার কর্তৃক লেবাননের পরিস্থিতির ব্যাপারে।

জাতিসংঘ বাজেট কিভাবে তৈরি করতে হবে সে সম্পর্কে সনদ কি বলছে?

সনদের ১৭ ধারা মতে সাধারণ পরিষদ বাজেট বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য দায়ী। এ পরিষদ কর্তৃক স্থিরকৃত হারে সদস্যরাষ্ট্রগুলো সংগঠনটির ব্যয়ভার বহন করবে।

সাধারণ পরিষদের একটি সহকারী সংস্থা – চাঁদা সংক্রান্ত কমিটি– চাঁদার হার নির্ধারণ করার জন্য ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত। সদস্যরাষ্ট্রগুলোর চাঁদা প্রদানের ক্ষমতা অনুযায়ী তাদের দেয় চাঁদার পরিমাণ ধার্য করা হয়। চাঁদা প্রদানের ক্ষমতা নিরূপণে দেশগুলোর জাতীয় আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ও জনসংখ্যা বিবেচনা করা হয়। ১৯৭২ সালে গৃহীত সাধারণ পরিষদের একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোনো একটি দেশের সর্বোচ্চ দেয় চাঁদার পরিমাণ সংস্থাটির নিয়মিত বাজেটের ২৫ শতাংশ ও সর্বনিম্ন দেয় চাঁদা ১ শতাংশের ১শ' ভাগের ১।

যদি কোনো দেশ সনদের ধারাগুলো অমান্য করে, তবে এ ব্যাপারে কি করা যায়?

যখন কোনো দেশ সনদের ধারাগুলো অমান্য করে অথবা এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গসংস্থাগুলো যেসব সিদ্ধান্ত নেয় তা অগ্রাহ্য করে, তখন সংস্থাটি লঙ্ঘনের প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

কোনো দেশ নিয়মিত বাজেট সম্পর্কিত দেয় চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে এবং বকেয়া চাঁদার পরিমাণ দু'বছরের দেয় অর্থের সমান বা বেশি হলে সেই সদস্য সাধারণ পরিষদে ভোটাধিকার হারাবে। কিন্তু সাধারণ পরিষদ যদি ঐ সদস্যের পক্ষে চাঁদা দেয়া সামর্থ্যের বাইরে (যথা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে) ছিল বলে সন্তুষ্ট হয়, তবে তাকে ভোটদানের অনুমতি দিতে পারে। অবশ্য ধারাটি কড়াকড়িভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

যখন কোনো দেশ শান্তিভঙ্গ করে অথবা আগ্রাসনমূলক কাজ করে অথবা আন্তর্জাতিক শান্তির প্রতি হুমকি সংক্রান্ত নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত অমান্য করে, তখন সপ্তম অধ্যায় অনুযায়ী সে দেশের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে (প্রশ্ন ৯ দ্রষ্টব্য)।

কোনো দেশ মানবাধিকার লঙ্ঘন করলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিশন অর্থাৎ মানবাধিকার কমিশন দেশটির মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধারা আলোচনা করতে পারে। মানবাধিকার কমিটি সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির অর্থাৎ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত ১৯৬৬ সালের কনভেনশনের ধারাগুলোর মান্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে। চুক্তিটির পরিধারণ ও বাস্তবায়নের জন্যই এ কমিটি গঠিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৯৩ সালে সাবেক যুগোশ্লাভিয়ায় আন্তর্জাতিক যুদ্ধ অপরাধ ট্রাইবুন্যাল সৃষ্টি করে (প্রশ্ন ৯ দ্রষ্টব্য)।

জাতিসংঘের কোনো অঙ্গসংস্থা চাইলেই কোনো দেশকে সনদের ধারাগুলো অমান্য করার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের কাঠগড়ায় নিয়ে যেতে পারে না। এটা অবশ্য অধিকাংশ লোকের বিশ্বাসের বিপরীত। রাষ্ট্রগুলো তাদের আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধাদি আন্তর্জাতিক আদালতে পেশ করতে পারে এবং জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট অঙ্গসংস্থাগুলো অথবা বিশেষ এজেন্সিগুলো আদালতের পরামর্শমূলক মতামত চাইতে পারে। আদালত ১৫ জন বিচারক নিয়ে গঠিত; এঁদের প্রত্যেকে ৯ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

সদস্যরাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সরল বিশ্বাস সংস্থাটির সাফল্যের পূর্বশর্ত। সনদের ৫ ধারা মতে, কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক প্রতিশোধমূলক অথবা বল প্রয়োগমূলক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সে রাষ্ট্রের সদস্যপদের অধিকার ও সুবিধাদি সাময়িকভাবে রহিত করা যেতে পারে। বহিস্কার হচ্ছে চূড়ান্ত ও কঠোরতম ব্যবস্থা, যার ফলে বিপথগামী রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। দেশগুলো যে সংস্থাটির অন্তর্ভুক্ত তা-ই তাদের আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্যপদের স্বীকৃতি। সুতরাং তাদের কাজকর্মের জন্য অবশ্যই জবাবদিহি হতে হবে এবং কতকগুলো দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সনদ অনুযায়ী কোনো দেশ কি জাতিসংঘ থেকে সরে আসতে বা বহিষ্কৃত হতে পারে?

৬ ধারা অনুযায়ী সনদে উল্লিখিত মূলনীতিগুলো ক্রমাগত ভঙ্গের জন্য দায়ী জাতিসংঘের কোনো সদস্যকে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ সংগঠন থেকে বহিষ্কার করতে পারবে।

তবে আজ পর্যন্ত কোনো সদস্যরাষ্ট্রই বহিষ্কৃত হয়নি। অবশ্য কোনো কোনো দেশকে সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়েছে, যেমন ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ১৯৯২ সালের পর থেকে যুগোশ্লাভ ফেডারেল প্রজাতন্ত্র (সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রো)। সাধারণ পরিষদ এসব সিদ্ধান্ত যে-কোনো সময় পাল্টিয়ে দিতে পারে।

সনদে সদস্যপদ প্রত্যাহারের কোনো ব্যবস্থা নেই। ১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয়া জাতিসংঘ বর্জন করে। তবে পরের বছর আবার ফিরে আসে।

সনদ কি সংশোধন করা যায় এবং তা কি কখনো হয়েছে?

১০৮ ধারা অনুযায়ী সনদ সংশোধন করা যেতে পারে। প্রথমে সংশোধনী সাধারণ পরিষদে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হতে হবে। তারপর নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগুলোসহ জাতিসংঘের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যরাষ্ট্রে স্ব স্ব সংবিধান অনুযায়ী তা অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সনদটি এ পর্যন্ত তিনবার সংশোধিত হয়েছে। ১৯৬৫ সালে নিরাপত্তা পরিষদের এবং ১৯৬৮ ও ১৯৭৩ সালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সংশোধনী আনা হয়।

সনদের ধারাগুলো পরীক্ষা করার জন্য কি ধরনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে? নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ ও ভোট পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো আলোচনা হয়েছে কি?

২১ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর বিশ্বে যেসব নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে, তারই প্রেক্ষিতে সদস্যরাষ্ট্রগুলো সনদের প্রাসঙ্গিকতা ও যথার্থতা আলোচনা করেছে। বেশ কয়েক বছর যাবৎ জাতিসংঘ সনদ ও সংস্থাটির ভূমিকা জোরদার করা সম্পর্কিত বিশেষ কমিটি নামক সাধারণ পরিষদের একটি সহকারী সংস্থা সনদের ধারাগুলো পরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।

১৯৯২ সালে সাধারণ পরিষদ পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও সংস্থাটির বর্ধিত সদস্যসংখ্যা মেনে নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের পুনর্গঠনের বিষয়টি আলোচনার জন্য গ্রহণ করে। এ পরিষদ সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ সম্প্রসারণ ও সমতাভিত্তিক (ভৌগোলিক) প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কিত সনদের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ সম্পর্কে তাদের মতামত মহাসচিবকে জানাতে অনুরোধ করে। সদস্যরাষ্ট্রগুলো (বর্তমানে যে পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের একচেটিয়া ভেটো ক্ষমতা রয়েছে তাদের বাদে) ভেটো ক্ষমতাসহ অথবা ভেটো ক্ষমতা ব্যতিরেকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্যপদ সম্প্রসারণের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে। নিরাপত্তা পরিষদের অন্যান্য সংস্কার, যথা ভোটদান পদ্ধতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং অন্যান্য অঙ্গসংস্থা বিশেষ করে সাধারণ পরিষদের সঙ্গে এর সম্পর্কের ব্যাপারেও তাদের আগ্রহ রয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ বৃদ্ধি ও সমতাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য ১৯৯৩ সালে সাধারণ পরিষদ একটি মুক্তপ্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে।

এত বছর পরেও কি সনদটি প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে?

এটা প্রায়ই বলা হয় যে, যেসব ঘটনার প্রবাহের ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয, তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সনদটি তৈরি করা হয। সুতরাং বিশ শতকের শেষ প্রান্তে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতি ও সংঘাতের প্রকৃতিগত পরিবর্তনের কারণে এটি আর গ্রহণযোগ্য নয়।

সদস্যরাষ্ট্রগুলো গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, সনদটি একটি চুক্তিপত্র, যা নমনীয়ভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার ও সম্ভব এবং এতে নতুন ও অদৃষ্টপূর্ব পরিবর্তনের জন্যও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

নিশ্চয়ই অতীতে সনদ সংশোধনের প্রয়োজন ছিল এবং ভবিষ্যতে আরো সংশোধনীর প্রয়োজন হতে পারে। সনদ পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে টিকে আছে এবং সদস্যরাষ্ট্রগুলোর সময়োপযোগী ও নীতিনিষ্ঠ কর্মপ্রয়াসের দ্বারা এর কার্যকারিতা অব্যাহত রাখা সম্ভব।

সনদটি একটি রূপরেখা মাত্র, এতে কোনো বিস্তারিত চিত্র নেই। নমনীয়তা ও দূরদৃষ্টির মধ্যে এর অন্তহীন শক্তি নিহিত রয়েছে।

* * *